বেঙ্গল টাইমস

১৭ জানুয়ারি সংখ্যা

আলোর পথযাত্রী

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

ফিরে দেখা

বছরের শুরুতেই ছিল পাহাড় সংখ্যা। আসলে, বিশ্ব উষ্ণায়নের দাপটে শীত কমতে কমতে এক–দেড় মাসে এসে ঠেকেছে। বছরের শুরু মানে এখান–ওখান পিকনিক, আর লম্বা ছুটি পেলে একটু বেরিয়ে পড়া। তাই সেবার রাজনীতি, খেলা, সিনেমা, ফিচার— এসবকে মুলতুবি রেখে পাহাড়েই পাড়ি জমিয়েছিল বেঙ্গল টাইমস।

এবারের সংখ্যাতেও বিষয়ের অভাব ছিল না। রাম মন্দিরকে ঘিরে সারা দেশেই উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা। সেই হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে ভোটে যাওয়ার চেষ্টা। এদিকে, সিবিআই–ইডি যথারীতি শীতঘুমে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তদন্তের নামে যা যা হচ্ছে, তা প্রহসন বলাই ভাল। এরই মাঝে হয়ে গেল বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ। এসে গেল জ্যোতি বসুর মৃত্যুদিনও।

জ্যোতি বসুর জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা হয়েছে। পাঠকমহলে তা সমাদৃতও হয়েছিল। কিন্তু এবার পনেরো তম মৃত্যুদিন। তার ওপর জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণের সূচনা। তাই এবার সেদিকে একটু আলো ফেলা যেতেই পারে। অন্তত এই আলোচনায় ধর্মীয় বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা নেই। সেইসঙ্গে যুবদের ব্রিগেড সমাবেশকেও একটু ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে বইমেলা। পরের সংখ্যা হয়তো বইমেলাকে ঘিরেই। থাকবে নানা আঙ্গিক থেকে বইমেলাকে খোঁজার চেষ্টা। পাঠকও সেখানে অংশ নিতে পারেন।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক,
বেঙ্গল টাইমস

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ

সাগর গুপ্ত

শুরুতেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, আমি কখনও ব্রিগেড যাইনি।

অনেকবার যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। ট্রেনে-বাসে খুব ভিড় হয়, এমনটাও জানি। হয়তো সেই কারণেই ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি। মনে হয়েছে, এত ধকল পোশাবে না।

একটা মন বলত, একবার অন্তত যাওয়া দরকার। অমনি, আরেকটা মন বলে উঠত, গিয়ে কী হবে! নেতারা কী আর নতুন কথা বলবেন! সেই তো একই ভাষণ। এগুলো ইউটিউবে কত শুনেছি।

এবার কেন জানি না, বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই নিজের মনকে তৈরি করছিলাম। মনে হচ্ছিল, এবার যেতেই হবে। এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম কলকাতার শহরতলিতে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ঠিক কলকাতা নয়, একটু দূরে। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছেও যাওয়া যায়।

শহরতলির ট্রেন ধরে দমদম। সেখান থেকে মেট্রোয় ময়দান। সেভাবেই পৌঁছে যাওয়া। কিছুটা আগেই পৌঁছে গিয়েছিলাম।

শীতের রোদ গায়ে মেখে, ময়দানে ঘুরতে মন্দ লাগছিল না। কত দূরদূরান্ত থেকে আসা কত হাজার হাজার মানুষ। কোচবিহারের মাঝবয়সীর সঙ্গে কী অবলীলায় গল্প জুড়ে দিয়েছে পুরুলিয়া থেকে আসা তরুণ। বর্ধমান থেকে আসা চাষি আর নদিয়ার কলেজ ছাত্রের মধ্যেও চলছে নানা মত বিনিময়। একমনে শুনছিলাম। অদ্ভুত একটা ভাল লাগা যেন কাজ করছিল। এরা কেউ কাউকে চেনে না। এই মাঠেই আলাপ। তবু ফোন নম্বর বিনিময় হচ্ছে। একে অন্যের সঙ্গে ছবি তুলছে। একে অন্যের এলাকার খোঁজ নিচ্ছে। কী করলে দলের ভাল হয়, কী করলে রাজ্যের ভাল হয়, সেই বিষয়ে দু'জনে নিজের নিজের মতো করে মতামত দিচ্ছে। কোথাও সেই মত মিলছে। আবার কোথাও একটু অমিলও থাকছে।

মনে হচ্ছিল, কোন আত্মীয়তার বন্ধন এদের এভাবে একে অন্যের সঙ্গে বেঁধে দিল! কী অবলীলায় কেউ একে অন্যকে 'কমরেড' বলছে। কেউ আবার বয়স্ক কমরেডকে কাকু বলেও সম্বোধন করছে। জলপাইগুড়ির সেই তরুণ কী অবলীলায় মেদিনীপুরের আরেক যুবককে ফোন নম্বর দিয়ে বলছে, ডুয়ার্সে এলে আমাদের বাড়িতে এসো কিন্তু। কোনও হোটেলে থাকতে হবে না। আমি তোমাদের জঙ্গলে ঘোরাবো।

হ্যাঁ, এটাই ব্রিগেডের মাহাত্ম্য। ওরা সবাই জানে, ওরা শেষ দুটো নির্বাচনে শূন্য। এই লোকসভাতেও বিরাট কিছু মিরাক্যাল ঘটে যাবে, এমন দিবাস্বপ্নও কেউ দেখছে না। ঘটলেই বা ওদের কী! ওরা তো মন্ত্রী হবে না, বিধায়কও হবে না, নিদেনপক্ষে পঞ্চায়েত

মেম্বারও হবে না। তবু লাল পতাকার প্রতি অদ্ভুত এক ভালবাসা।

আচ্ছা, আমি কেন এসেছি! আমি তো আর সে অর্থে সিপিএম করি না। মিছিলেও হাঁটি না। পাড়াতেও বিরাট কিছু বিপ্লব করি, এমন অভিযোগ নেই। কেউ রাজনীতি নিয়ে তর্ক করলে বরং কিছুটা গা বাঁচিয়েই চলি। বাবা–কাকারা এই দলটাকে ভালবাসে। এই দলটা কোথাও জিতলে ভাল লাগে। হারলে কষ্ট পাই। এই তো। এর বেশি তো কিছু নয়।

আমি কী এমন দায়িত্ব পালন করি! বলতে গেলে, কিছুই না। ফেসবুকে নানা ছবি আসে, লেখা আসে। ভাল লাগলে পড়ি। দু একজনকে পাঠাই। কোথাও লাল পতাকার মিছিল দেখলে, সেই মিছিলে মানুষের সমাগম দেখলে মনে বল পাই। টিভিতে বামেদের কেউ কিছু বললে, মন দিয়ে শুনি। কথাটা মনে ধরলে বন্ধুদের আড্ডায় দু–একজনকে বলি। এই তো। এর বেশি তো কিছু নয়।

কেন জানি না, এই মীনাক্ষী নামের মেয়েটাকে বেশ লাগছে। মেয়েটা সত্যিই লড়াকু। মফস্বল থেকে উঠে আসা। কথার মধ্যে একটা হালকা হিন্দি মেশানো টান আছে। আটপৌরে পোশাক। আটপৌরে ভাষা। সুন্দরভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে। তেমন দেখনদারি নেই। টিভি স্টুডিওতেও দেখি না। মেয়েটা আজ কোচবিহার, কাল মালদা, এই করে বেড়াচ্ছে। টানা দু মাস ধরে আড়াই হাজার কিলোমিটার হাঁটা কি চাট্টিখানি কথা! এই মেয়েটা করে দেখিয়েছে।

মনে হল, মেয়েটা যখন এত লড়াই করছে, ওর দুটো কথা একটু শুনে আসি। তাই তো আসা।

বাড়িতে থাকলেই বা কী করতাম! হয়তো ফেসবুকে চোখ রাখতাম। হয়তো কোনও ওয়েব সিরিজ দেখতাম। এমন কত দিন এমন অপচয়েই পেরিয়ে যায়। কী করলাম, পরের দিন আর মনেও থাকে না।

কিন্তু এই ব্রিগেডের কথা! অনেকদিন মনে থাকবে। এই ব্রিগেড থেকে একবুক অক্সিজেন নিয়ে ফিরলাম। মনে হল, দিনটা সার্থক। এলাকার কোনও মিটিং বা মিছিলে হয়তো এরপরেও আমাকে দেখা যাবে না। চায়ের দোকানের তর্কেও হয়তো গুটিয়েই থাকব। তবু মনে মনে এই দলটাকে যেন আরও একটু ভালবেসে ফেললাম।

মীনাক্ষীকে সবাই দেখলাম ‘ক্যাপ্টেন’ বলছে। আমারও খুব বলতে ইচ্ছে করছে। ক্যাপ্টেন, লাল সেলাম।

হাল ছেড়ো না বন্ধু
বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে
দেখা হবে তোমায় আমায়
অন্য গানের ভোরে।

এই ব্রিগেডে অনেকটাই সদয় ছিল মূলস্রোত মিডিয়া

অরিত্র দাস

বামেদের ব্রিগেড নিয়ে মূলস্রোড মিডিয়ার উপেক্ষাটা অনেক দিনের। তৃণমূলের ব্রিগেড বা বিজেপির ব্রিগেড যতখানি গুরুত্ব পায়, বামেদের ব্রিগেড সেই তুলনায় কিছুই গুরুত্ব পায় না। গত কয়েক বছর ধরে এই ছবিটাই দেখে আসছি।

কিন্তু এবার অনেকটাই যেন ব্যতিক্রম। মূলস্রোত মিডিয়া অনেকটাই যেন সদয়। দু'তিন দিন আগে থেকেই এই ব্রিগেডের প্রস্তুতি নিয়ে নানা রকম প্রতিবেদন দেখা গেছে। রবিবার সকাল থেকেই টিভি ছিল অনেকটাই ব্রিগেড কেন্দ্রিক। শুধু সভার সরাসরি সম্প্রচার নয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন মিছিল। কোনওটা আসছে হাওড়া থেকে, কোনওটা আবার শিয়ালদা থেকে। কোনওটা টালিগঞ্জের দিক থেকে। কোনওটা পার্ক সার্কাসের দিক থেকে। বিভিন্ন চ্যানেল এইসব

বিভিন্ন পয়েন্টে লোক নিয়োগ করেছিল। সকাল থেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই এই কভারেজ দেখা গেছে।

ইচ্ছে থাকলেও আমি ব্রিগেড যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম, টিভিতে কিছুই দেখাবে না। ফেসবুকের বিভিন্ন পেজেই মূলত চোখ রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু সকাল থেকেই দেখলাম, সব চ্যানেলেই কম-বেশি ব্রিগেড কভারেজ। বাম নেতাদের বক্তব্যও দেখানো হচ্ছে। গ্রাম থেকে আসা মানুষের বক্তব্যও তুলে ধরা হচ্ছে। এবং তেমন নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ নেই।

দেখে সত্যিই ভাল লাগল। প্রায় সব চ্যানেলেই পুরো সমাবেশ দেখানো হল। দীর্ঘদিন বাদে রাজ্যের তথাকথিত যুবরাজের সভা। এতদিন কেন গুটিয়ে ছিলেন, কী বার্তা দিতে চান, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা কতখানি, এদিকে ফোকাস হতেই পারত। কিন্তু চ্যানেলগুলির মূল ফোকাস ছিল বামেদের সভার দিকেই। মীনাক্ষী মুখার্জি বা মহম্মদ সেলিম তো বটেই, সবার বক্তব্যই সরাসরি সম্প্রচার হল।

মিডিয়ার কাছে এমন আচরণই তো প্রত্যাশিত। সবার সামনে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। তাতে কিছু বিষয়কে বাড়তি প্রাধান্য দিতেই হয়। শাসক যতটা গুরুত্ব পাবে, বিরোধীদের সমাবেশ ততখানি গুরুত্ব না পেতেই পারে। তাই বলে বিরোধীরা যেন একেবারেই উপেক্ষার পাত্র না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকেও সচেতন থাকাটা জরুরি। লোকসভা ও বিধানসভায় শূন্য পাওয়া বামেদের ব্রিগেডকে ঘিরে এমন কভারেজ কেন? আসলে, তারুণ্যের ডাকে এই ব্রিগেড অনেকেরই মন ছুঁয়ে গেছে। এমনকী যাঁরা বাম বিরোধী, তাঁদের মনেও কোথাও একটা ছাপ ফেলে গেছে। সেই কারণে, মিডিয়া নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেনি।

এটা বামেদের কাছেও বড় একটা শিক্ষা। ঠিকঠাক দাবি নিয়ে জমায়েত হলে, তরুণ ব্রিগেডকে সামনে এগিয়ে দিলে, মানুষের মনে ইতিবাচক ছাপ ফেলা যায়। মিডিয়াকে গালমন্দ অনেক হয়েছে। অন্তত এই ব্রিগেডের পর একটা ধন্যবাদও কিন্তু মূলস্রোত মিডিয়ার প্রাপ্য।

কারও ‘দাদা’ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি

স্বরূপ গোস্বামী

কেউ বলতেন জ্যোতি বসু। কেউ বলতেন জ্যোতি বাবু। কেউ বলতেন, মিস্টার বাসু। কেউ বলতেন সিএম। কিন্তু কাউকে কখনও ‘জ্যোতিদা’ বলতে শুনেছেন? ক্যাবিনেটের সদস্য থেকে দলীয় নেতা। সিনেমা তারকা থেকে সাংবাদিক। শিল্পী থেকে শিল্পপতি। আমলা থেকে সাহিত্যিক। কারও কাছেই তিনি ‘দাদা’ ছিলেন না। হয়ে ওঠার চেষ্টাও করেননি।

হঠাৎ রাস্তায় নেমে ঝালমুড়ি খেতে হয়নি। ভিড়ের মধ্যে এর তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি তুলতে হয়নি। কারও বাচ্চাকে কোলে নিয়ে গাল টিপে দিতে হয়নি। কারও মোটর সাইকেলের পিছনে চেপে বসতে হয়নি। রাস্তার ধারের দোকানে নেমে গিয়ে চা বা মোমো বানিয়ে ছবি তুলতে হয়নি। বলতে পারেন, জনতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশার চেষ্টা করেননি। কেউ বলতেই পারেন, উন্নাসিক। কেউ বলতে পারেন দাম্ভিক।

কিন্তু তিনি এইরকমই। তিনি যেমন, তিনি তেমনই। ফটোগ্রাফারদের পোজ দেওয়ার জন্য বাড়তি কিছু করতে হয়নি। কাগজে ছবি ছাপাতে গিয়ে কাছাকাছি আসার ভনিতা করতে হয়নি।

জ্যোতিবাবু কি কবিতা পড়তেন? কী জানি। নিজের মুখে কখনও কবিতা আওড়াতে অন্তত শোনা যায়নি। জ্যোতি বাবু কি গান

শুনতেন? বোঝার উপায় নেই। জ্যোতি বাবু সিনেমা দেখতেন? তাও বলা মুশকিল। কারণ, কোন অভিনেতাকে কেমন লাগে বা কোন সিনেমা কেমন লেগেছে, এসব নিয়ে কথা বলতে তেমন শোনা যায়নি। জ্যোতি-বাবু কি ডাক্তারি বুঝতেন? শিল্প–সংস্কৃতি বুঝতেন? বলা মুশকিল। কারণ, প্রকাশ্যে এসব নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়নি। আসলে, তিনি এরকমই। যেটা বোঝেন না, জোর করে বুঝি প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি। যেটা সত্যিই বোঝেন, সেটাও জাহির করেননি।

কোন কাগজ কী লিখল না লিখল, তাতে তাঁর খুব একটা মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। অন্তত প্রকাশ্যে সেভাবে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। চূড়ান্ত সমালোচনা করলেও বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যায়নি। কজন সাংবাদিককে নামে চিনতেন, তাও সন্দেহ আছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে মুড়ি খাওয়া, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া বা রাজ্যসভায় পাঠানো, এসব থেকে অনেকটাই দূরে। তাঁর বৃত্তে পৌঁছতে না পারলে দূর থেকে 'উন্নাসিক' মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু তিনি বুঝতেন, মানুষ কী চায়। বুঝতেন, মানুষের কোনটা প্রয়োজন। তাই ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে ভূমি সংস্কারের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। শুধু সিদ্ধান্ত নিয়েই ক্ষান্ত হননি, কঠোরভাবে রূপায়ণ করেছেন। চোদ্দ লক্ষ একর জমি বিলি হয়েছে প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে। ভাবা যায়! প্রথম দিনেই বলেছিলেন, রাইটার্স থেকে সরকার চালানো হবে না। গ্রামের উন্নয়ন গ্রামের মানুষ ঠিক করবেন। ঠিক পরের বছরই সার্বিক পঞ্চায়েত। তিনটি স্তরে বেঁধে দিলেন গ্রামীণ উন্নয়নের রূপরেখা। গ্রামের চাষিও হয়ে গেলেন পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রামের উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করলেন গ্রামের মানুষেরাই। কোথাও কৃতিত্ব নিতে যাননি। পঞ্চায়েত বা পুরসভার কাজে ফিতে কাটতে যাননি। পাড়ার রাস্তা থেকে পুকুর ঘাট বাঁধানোয় 'অনুপ্রেরণা' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি। আবার যখন শিল্পের প্রয়োজন, তখনও সময়ের দাবি মেনে অগ্রাধিকার বেছে নিতে ভুল করেননি। রাজারহাটের মতো আস্ত উপনগরী নিঃশব্দে হয়ে গেল। কেউ টেরও পাননি। কারণ, প্রচারের ঢক্কানিনাদ ছিল না।

কেন্দ্র বন্ধু সরকার ছিল, এমন নয়। বরং, নানা কাজে বাধা এসেছে বিস্তর। কখনও পাওনাগন্ডা নিয়ে দরকষাকষি করতে হয়েছে। রাজনীতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমালোচনাও করতে হয়েছে। আবার প্রশাসকের চেয়ারে বসে কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কের বিন্যাসেও নতুন মাত্রা এনেছেন। দুই দলের জোটই পাঁচ বছর টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সেখানে এতগুলো দলকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার। অথচ, কোনও শরিকই নিজেদের বঞ্চিত বলতে পারবে না। বরং, যতখানি গুরুত্ব প্রাপ্য, তার থেকে বেশিই দিয়েছেন।

এই উদারতা ও সমন্বয় আর কোথায় পাবেন!

তাঁর আমলেও পাহাড় অশান্ত হয়েছিল। গোর্খাল্যান্ডের নামে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দক্ষ ও দূরদর্শী প্রশাসকের মতোই সামাল দিয়েছেন। পাহাড়ে শান্তি ফিরেছিল। কিন্তু ঢাক পিটিয়ে 'পাহাড় হাসছে' হোর্ডিং দিতে হয়নি। সেখানে উন্নয়নের কৃতিত্বের ভাগিদার হতে যাননি।

সেই সময়েও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির কম চেষ্টা হয়নি। বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে সেই সময়েই। দেশের নানা প্রান্তে হয়েছিল দাঙ্গা। এই বাংলায় তার আঁচ পড়তে দেননি। প্রশাসকের নমনীয়তা ও দৃঢ়তা, দুটোই সেদিন দেখেছিল বাংলা। সবাইকে রাস্তায় নামিয়েছিলেন। একটা টিভি ইন্টারভিউতে জাভেদ আখতার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার রাজ্যে দাঙ্গা হয় না কেন? এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'কিঁউ কি হুকুমত নেহি চাহতি।' অর্থাৎ, প্রশাসন চায় না, তাই দাঙ্গা হয় না। ছোট্ট একটি বাক্য। কী বিশাল তার ব্যপ্তি। মনে পড়ছে নয়ের দশকের শেষ দিকে আরও একটি ছোট্ট ঘটনা। সেদিনই অযোধ্যায় বিশ্বহিন্দু পরিষদের মিটিং ছিল। যথারীতি হুঙ্কার ছাড়া হয়েছে। জ্যোতিবাবু মহাকরণ থেকে বেরিয়ে আসছেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ঘোষণা করেছে, এক বছরের মধ্যে তারা রাম মন্দির

গড়বে। আপনরা প্রতিক্রিয়া? জ্যোতি বাবু থমকে দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবি দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে জানালেন, 'আমি কী করব? মাথায় করে ইট বইব নাকি?' বলেই গটগট করে এগিয়ে গেলেন লিফটের দিকে। ছোট্ট একটি বাক্য। কী মারাত্মক বার্তা লুকিয়ে আছে। সেদিন তাঁকে 'লা আল্লা ইলাহি' বলতে হয়নি। সেদিন তাঁকে চণ্ডীপাঠের মন্ত্র আওড়াতে হয়নি। নজরুলের কবিতাও বলতে হয়নি। সচেতন তাচ্ছিল্য দিয়েই রুখতে পেরেছিলেন সাম্প্রদায়িক প্রচার।

কোন জেলায় কে সম্পাদক হবেন, কে কে কমিটিতে থাকবেন, সে ব্যাপারে মাথা গলানোর চেষ্টা করেননি। সংগঠন যাঁরা বোঝেন, তাঁদের হাতেই ছেড়ে রেখে-ছিলেন। তাই দল আর প্রশাসনকে আলাদা করতে পেরেছিলেন। কোনটা দলের মঞ্চে

বলতে হয়, কোনটা প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে বলতে নেই, এই পরিমিতি বোধটা ছিল। আবার কীভাবে দুর্নীতি আটকাতে হয়, সেটাও জানতেন। লোক দেখানো ভাষণে নয়, কাজে করে দেখিয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগের নামে বহু জায়গায় দলের লোক ঢুকে পড়ছে, কোথাও কোথাও টাকা পয়সার লেনদেন হচ্ছে, এই বিষয়টি তাঁর নজর এড়ায়নি। গায়ের জোরে অস্বীকারও করেননি। চালু করলেন স্কুল সার্ভিস কমিশন। তারপর থেকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি বিষয়টা কার্যত অতীত হয়ে গেল। স্বচ্ছভাবে নিয়োগটাই হয়ে উঠল স্বাভাবিক রীতি। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপন করতে হয়নি। এতবড় একটা সংস্কার যেন নিঃশব্দেই হয়ে গেল।

১৯৯৬। সারা দেশের বিজেপি বিরোধী সমস্ত দল একবাক্যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাইল। তাঁর দল চাইলেই আর কোথাও কোনও বাধা ছিল না। দলের মধ্যেও দুদিন ধরে চলল বিতর্ক। শেষমেশ দলের সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন অনুগত সৈনিকের মতো। (কষ্টকল্পনা হলেও একবার ভেবে দেখুন, সব আঞ্চলিক দল চাইছে, মমতা প্রধানমন্ত্রী হোন। অথচ, তৃণমূলের এমপি–রা বলছেন, আমরা সরকারে যাব না। পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াত, শুধু একটু কল্পনা করুন।)

প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবি থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। ভারতীয় রাজনীতিতে এমন উদাহরণ আর আছে! ঠিক চার বছর পর। স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকেও। এ দেশের রাজনীতিতে এমন উদাহরণও বিরল। ক্ষমতার শীর্ষ থেকে এভাবেও সরে যাওয়া যায়! যায়, যদি তাঁর নাম জ্যোতি বসু হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আচ্ছন্ন প্রজন্মের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, জ্যোতি বসু ঠিক কেমন ছিলেন। সিলেবাসেও নিজেকে ঢোকানোর চেষ্টা করেননি। নিজের কাজের ভিডিও করেও রাখেননি। ছবি তুলিয়েও রাখেননি। তাই ইউটিউব বা সবজান্তা গুগল ঘাঁটলেও বিরাট কিছু পাবেন না। ঢালাও বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারের আনুকূল্যে জ্যোতি বাবুদের ভেসে থাকতে হয় না। তাঁরা থেকে যান কাজে। তাঁরা থেকে যান চেতনায়। ‘জ্যোতি বসু, ছোট্ট নাম, কী বিরাট ব্যক্তিত্ব’।

এমন তো কতই হয়

রক্তিম মিত্র

আগে ভাইরাল বললে বোঝাত ভাইরাল জ্বর। গত কয়েকবছর এই শব্দের মানেটাই কেমন বদলে গেছে। এখন ভাইরাল বললে এসে যায় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম এইসব। মোদ্দা কথা, কোনও লেখা বা কোনও ছবি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে বলা হয়, ভাইরাল হয়ে গেছে।

তিন দশক আগে এসব সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। সারাক্ষণ খবরওয়ালা চ্যানেল ছিল না। ব্রেকিং নিউজ নামক শব্দটা ছিল না। কিন্তু একটি কথা ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। যা আজও ফেসবুকে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও শ্লীলতাহানি হলে গলা ফুলিয়ে কেউ কেউ বলতে থাকে। এমনকী বামেদের যেখানে হেয় করার দরকার হয়, সেখানে চিমটি কাটার মতো এই কথাটা ব্যবহার হয়।

বাক্যটা হল, ‘এমন তো কতই হয়।’ দিব্যি এই কথাটা জ্যোতি বসুর নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। অথচ, এই কথাটা জ্যোতি বসু কোনওদিন উচ্চারণও করলেন না। তা সত্ত্বেও কী অবলীলায় তাঁর নামে চালিয়ে দেওয়া হল। টিভির তর্ক বিতর্কে মাঝে মাঝেই তৃণমূল বা বিজেপির প্রতিনিধি এই কথাটা জ্যোতি বাবুর নামে চালিয়ে দেন। আর সেই চ্যানেলে হাজির বাম নেতা তখন মাথা নামিয়ে কার্যত স্বীকার করেই নেন। এখনও পর্যন্ত কাউকেই বলতে শুনলাম না, ওটা জ্যোতিবাবু বলেননি। অথচ, সত্যিই জ্যোতিবাবুর মুখ থেকে ওই বাক্যটা বেরোয়নি।

বানতলায় যেদিন নৃশংস ঘটনাটি ঘটে, সেদিন জ্যোতি বসু রাইটার্সেই ছিলেন। সম্ভবত, বিকেলের দিকে খবরটি পৌঁছয়। তখন মোবাইল ছিল না। তবু, প্রেস কর্নারে সাংবাদিকদের কাছে নানা সূত্র থেকে খবর ঠিক এসে যেত। কোনও কোনও সাংবাদিক জানতেন, বানতলায় এরকম একটি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। সন্ধে নাগাদ জ্যোতিবাবুর ঘরে গেলেন সাংবাদিকরা। বানতলার ঘটনা

সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। প্রশ্নটা ছিল ইংরাজিতে। স্বভাবতই জ্যোতিবাবু উত্তর দিলেন, 'ভেরি স্যাড।' আবার কোনও এক ইংরাজি কাগজের সাংবাদিক ইংরাজিতেই প্রশ্ন করলেন, যার মানে, আপনি কি স্বীকার করছেন, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে? জ্যোতিবাবুও ইংরাজিতেই জবাব দিয়েছিলেন, 'ইট হ্যাপেন্স।' তারপর আরও কয়েক লাইন বললেন, যার নির্যাস, 'ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কখনও কখনও এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কিন্তু এটা মোটেই গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি নয়। একটা ঘটনা দিয়ে গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি বিচার করা ঠিক হবে না।' জ্যোতিবাবু অনেক সময় বাক্য সম্পূর্ণ করতেন না। তাই, যেটা বলতে চাইছেন, অনেক সময় পরিষ্কার হত না। বিভ্রান্তির কিছু অবকাশ থেকে যেত।

কিন্তু ওই যে 'ইট হ্যাপেন্স'। একটি বাংলা কাগজে তার বাংলা তর্জমা হয়ে গেল 'এমন তো কতই হয়।'
সেটাই দশকের পর দশক ধরে ভাষণে ভাষণে ছড়িয়ে গেল। কেউ কেউ নিজের মতো করে অতিরঞ্জিত করে বসলেন। আজও সেই অতিরঞ্জনের ট্রাডিশন চলছে। আজও কোথাও নারী নির্যাতন ঘটলে তৃণমূল নেতারা বলে থাকেন, 'বাম আমলেও এসব হত। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো বলেছিলেন, এমন তো ঘটতেই পারে। এমন তো কতই হয়। এ নিয়ে হইচই করার কী আছে?' বলা হয়, বানতলায় যে এত এত নারীর ধর্ষণ হল, তার কোনও বিচার হয়েছে? সব ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। ঘটনা হল, সেই ঘটনায় পরেরদিনই পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে। তাদের অপরাধ প্রমাণ হয়েছে কয়েক বছরের মধ্যেই। সবাই যাবজ্জীবন জেল খাটছে। কিন্তু মিথ্যা প্রচারটা থেকেই গেছে।

যেমনভাবে থেকে গেছে, এমন তো কতই হয়!

সব চা একইরকম, প্যাকেটগুলো আলাদা

সরল বিশ্বাস

এই তো সেদিন, চিরঘুমের দেশে চলে গেলেন ডলি রায়। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কে এই ডলি রায়? উত্তর হল, এশিয়ার প্রথম মহিলা টি টেস্টার। চায়ের দুনিয়ায় বেশ পরিচিত নাম। কিন্তু বাঙালি সেভাবে খোঁজ রাখেনি। এই ডলি রায়ের আরও একটা পরিচয় আছে। সেটা বললে হয়তো অনেকে চিনবেন। তিনি ছিলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের স্ত্রী।

ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপণে ডলি রায়ের চায়ের একটি বিপণি ছিল। চা চা চা নামে একটি উৎসব করতেন। সমাজের নানা স্তরের অতিথিরা আসতেন। সৌগত রায় অনেকবার সেখানে জ্যোতি বসুকে নিমন্ত্রণ করেছেন। নানা কারণে জ্যোতি বাবুর যাওয়া হয়নি। একবার সৌগতবাবু নাছোড়বান্দা। জ্যোতিবাবুকে দিয়েই উদ্বোধন করাবেন। জ্যোতিবাবু এবার রাজি হয়ে গেলেন।

উদ্বোধনের পর গোটা প্রদর্শনী ঘুরিয়ে দেখানো হল। কোন চায়ের বিশেষত্ব কী, কোন চা কোন দেশে রপ্তানি হয়, কোন দেশে কোন চায়ের কেমন কদর, কত দাম, এসব বলা হল। পরে ছিল ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান। সেখানে অভিনব একটি ভাষণ দিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু। জানি না, এর কোনও রেকর্ডিং আছে কিনা। ডলি রায়ের কাছে হয়তো ছিল। তবে, স্মৃতি থেকে কিছুটা উদ্ধার করতে পারি। মনে হল, বেঙ্গল টাইমসের পাঠকদের জন্য তা তুলে ধরা যায়। জ্যোতিবাবু কতটা রসিক এবং কতটা অকপট স্বীকারোক্তি তিনি করতে পারেন, তা কিছুটা বোঝা যাবে।

শুরুতে যেমন ভূমিকা থাকে। তারপরেই এলেন মূল বিষয়ে: এখানে সৌগতবাবু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে

অনেককিছু দেখালেন। কোন চা ইউরোপে যায়, কোনটা আমেরিকায় যায়। কিন্তু উনি বললেন না, এটা পুরুলিয়ায় যায়, এটা মেদিনীপুরে যায়। বাংলার মানুষেরা কি চা খায় না? আমি তো রাস্তার ধারে লাইন দিয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তারা নাকি চা খায়। ভিখারিরাও চা খায়। কিন্তু সৌগতবাবুরা সব চা-ই দেখছি বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এটা তো ঠিক নয়। এখানকার মানুষের জন্যও তো চা তৈরি করতে হবে। সব বিদেশে পাঠিয়ে দিলে হবে!

উনি বললেন, এটা হাজার টাকা কেজি, এটা দু হাজার টাকা কেজি। আমাকে এসব বুঝিয়ে কাজ নেই। আমিও নানা জায়গায় যাই। শুনেছি, দামী চা দেওয়া হয়। কিন্তু হাজার টাকার চায়ের সঙ্গে দু হাজার টাকার চায়ের কী তফাত, আমি বুঝি না। ওনার স্ত্রী নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু আমার তো মনে হয়, সব চা গুলোই একই, শুধু প্যাকেট গুলো আলাদা।

একবার লন্ডনে হোটেলে সকালে চা খাচ্ছি। ম্যানেজার দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলবে। আমি তাকালাম। ম্যানেজার বলল, স্যার, এটা ফেমাস দার্জিলিং টি। ওই ছোকরা আমাকে দার্জিলিং চেনাচ্ছে। ও জানে না যে দার্জিলিংটা পশ্চিমবঙ্গে আর আমি সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী। ও জানুক আর না জানুক, বিদেশির মুখে দার্জিলিং চায়ের সুনাম শুনে ভাল লাগল। বেশ গর্বই হল। কিন্তু দার্জিলিং চা খেতে আমাকে লন্ডন যেতে হবে কেন? এখানে কেন পাব না? আজ বুঝতে পারছি, এই সৌগতবাবুরা সব চা-ই বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

হ্যাঁ, এই ছিল ভাষণের নির্যাস। বাকিরা ইংরাজিতে বললেও জ্যোতিবাবু সেদিন পরিষ্কার বাংলাতেই বলেছিলেন। বাকিরা চায়ের জগতের দিকপাল। চা সম্পর্কে তাঁদের বিস্তর জ্ঞান উগরে দিচ্ছিলেন। জ্যোতিবাবুও চাইলে সেক্রেটারিকে দিয়ে চা নিয়ে একটা জ্ঞানগর্ভ ভাষণ তৈরি করে আনতে পারতেন। চায়ের বাণিজ্য, চা শিল্পের সম্ভাবনা, সঙ্কট, সরকারি পরিকল্পনা-এসব নিয়ে নিজের ঢাক পেটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই রাস্তাতেই গেলেন না। একেবারে সহজ-সরল, সাদামাটা ভাষায় নিজের অনুভূতি তুলে ধরলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর কাছে সবাই সেদিন ম্লান। শুধুমাত্র সরলতা এবং অকপট স্বীকারোক্তির জন্যই তিনি বাকিদের থেকে আলাদা। তাঁর দলের আর কাউকে এত সহজ ভাষায় কথা বলতে শুনিনি।

জ্যোতিবাবু জঙ্গলের বড় বাঘের মতো

কয়েক বছর আগে, জ্যোতি বসুর জন্মদিনে ইজেড-সিসি-তে একটি অনুষ্ঠান। সেখানে জ্যোতি বাবুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। একেবারে ভিন্নধর্মী একটি ভাষণ। বেঙ্গল টাইমসে সেই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখনও মাঝে মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আপন খেয়ালে লেখাটি ঘুরে বেড়ায়। সেই লেখাটি তুলে ধরা হল।

১) রবীনবাবু আমার বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি বলেছিলাম, যাব। তবু বয়স বাড়ছে তো। শরীর তেমন সঙ্গ দিচ্ছে না। আসতে পারব কিনা নিশ্চিত ছিলাম না। শেষপর্যন্ত কিছুটা জেদ করেই চলে এলাম। এই জেদ বাড়িয়ে দিল একটি টিভি চ্যানেল। তারা নানা রকম উল্টোপাল্টা প্রশ্ন শুরু করে দিল। কেন আপনি যাবেন, জ্যোতি বসুর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক। রীতিমতো ধমক দিতে শুরু করল। তখন আমারও জেদ চেপে গেল। আর বাঙালের জেদ চাপলে কী হয়, তা তো জানেন। চলে এলাম।

২) জ্যোতি বাবুর দাদা-বউদি আমার মক্কেল ছিলেন। তাঁর ভায়রাভাইও আমার মক্কেল। অতি সজ্জন মানুষ। তাঁদের কাছে জ্যোতি বাবুর অনেক কথা শুনেছি।

৩) আমি যেসব কথা বলব, তা একটু অন্য রকমের। বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা অনেক গুণী মানুষ। তাঁরা অনেককিছু জানেন। অনেকেই সুবক্তা। তাঁরা সেসব কথা বলবেন। আমি বরং আমার মতো করে বলি।

৪) আমার কাছে জ্যোতিবাবু বনের এক বড় বাঘের মতো। আমি জঙ্গলে ঘোরাফেরা করি।

তাই আমি আমার ভাষাতেই বলি। সেই বাঘ, যাকে গোটা জঙ্গল সমীহ করে। যাকে অনেকের মাঝেও আলাদা করে চেনা যায়।

৫) প্রবল তাঁর ব্যক্তিত্ব। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। কিন্তু যখন বলতেন, সেটাই হত শেষ কথা। সচরাচর তিনি হাসতেন না। কিন্তু যখন হাসতেন, সেই হাসি দেখলে ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েও প্রেমে পড়ে যেত।

৬) আপনারা যাই বলুন, উনি বক্তৃতা একদম ভাল দিতেন না। কোনও বাক্য সম্পূর্ণ করতেন না। আমি বললাম, ওরা বলল, এই সব বলতেন। কিন্তু যাদের জন্য বললেন, তাঁরা ঠিক বুঝতেন। কী বলতে চাইছেন, তা নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না।

৭) এখনকার রাজনীতিকদের দেখি। এখন রাজনীতি ভাল একটা প্রফেশন। এত সহজে এত রোজগার আর কোনও প্রফেশনে হয় না।

৮) একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। চাইলে কী আরামে জীবনটা কাটাতে পারতেন! কিন্তু কালো কোট তুলে রেখে তিনি নেমে পড়লেন লড়াই সংগ্রামে। জ্যোতিবাবুর মতো লোকেরা টাকার জন্য, গাড়ি-বাড়ির জন্য রাজনীতিতে আসেননি। সারা জীবন একটা মূল্যবোধের রাজনীতি করে গেছেন। একটা আদর্শের জন্য লড়াই করেছেন।

৯) হয়ত তাঁর সব ভাবনা সব সময় সঠিক ছিল না। কোনও কোনও বিষয় নিয়ে সমালোচ-না হয়েছে। আমিও নানা সময়ে সমালোচনা করেছি। কিন্তু সেই ভাবনার মধ্যে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর আন্তরিকতা বা সদিচ্ছা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না।

১০) জ্যোতিবাবুর চেলাদের কথা একটু বলি। অনেকেই এই মঞ্চে আছেন। এই যে বিমান বাবু। সারা জীবন বিয়েই করলেন না। সাদাসিধে মানুষ। খালি রুমাল হারিয়ে ফেলেন। একবার বইমেলায় একসঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। পকেট হাতড়াচ্ছেন, রুমাল খুঁজে পাচ্ছেন না। আমার কাছে দুটো রুমাল ছিল। একটা ওনাকে দিলাম। বললাম, রুমাল দিতে নেই। এটা কিন্তু ফেরত দেবেন। উনি বললেন, আপনার জন্য আমি এক ডজন ভাল রুমাল এনে দেব। কত বছর পেরিয়ে গেল। আজও সেই রুমাল উনি দিলেন না। যাঁরা এত ভাল কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের এমন ছোটখাটো ভুল ধরতে নেই। ওনার দুটো মস্তবড় দোষ। সারাজীবন বিয়ে করলেন না। দুই, মেয়েদের সম্পর্কে কোনও আকর্ষণ আছে বলেও মনে হয় না। এই দুটোকে অনেকে

বলবেন গুণ। আমি দোষই বলব। তবে যাঁদের এতরকম গুণ থাকে, তাঁদের এমন দু একটা দোষ থাকলে ক্ষতি নেই। এই দুটো দোষ আছে বলেই উনি এত মানুষের কাজ করতে পারছেন।

১১) এই যে বুদ্ধবাবু। খুব পড়াশোনা করেন। জ্যোতিবাবুকে কিছু বললেই উনি বলতেন, ওটা বুদ্ধ জানে। ও খুব পড়াশোনা করে। পড়াশোনা একটা মহৎ গুণ। বামপন্থীদের সঙ্গে পড়াশোনার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বুদ্ধবাবুর আরেকটা পরিচয় আপনারা জানেন না। আপনারা জানেন না উনি কোন পরিবারের ছেলে। একবার উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমার লেখার টেবিলে পুরোহিত তর্পন দেখে বললেন, এটা নিয়ে আপনি কী করছেন? আমি বললাম, আমি মূর্খ মানুষ। বেশি কিছু জানি না। এখান থেকে টুকি, ওখান থেকে টুকি। সেদিন জেনেছিলাম, এই পুরোহিত তর্পনের লেখক তাঁর নিজের জ্যাঠামশাই? বুদ্ধবাবুকে নিজের মুখে এটা কোনওদিন বলতে শুনেছেন? মানুষটা বড় অন্তর্মুখী। এটা মস্তবড় গুণ, আবারও দোষও। কারণ, রাজনীতি করতে গেলে এত অন্তর্মুখী হলে চলে না, একটু বহির্মুখী হতে হয়।

১২) আমার বাঁদিকে আছে সীতারাম। এঁকে আপনারা সবাই চেনেন। আমি চিনি অনেকদিন ধরে। আমার মেয়ে জে এন ইউ-তে পড়ত। আর জে এন ইউ-র এক উজ্জ্বল ছাত্র সীতারাম ইয়েচুরি। এখনও যদি জে এন ইউ-তে যান, বুঝতে পারবেন সবাই ওকে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখে। চাইলে, দেশ-বিদেশের বড় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারত। সে পথে গেলই না। ওর আরেকটা পরিচয় আপনারা জানেন না, ও ভয়ঙ্কর এক লেডিকিলার। এমন সুন্দর দেখতে একটা ছেলে, লেখাপড়ায় দারুণ, বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান, দারুণ কথা বলে। তার প্রেমে মেয়েরা পড়বে না! সেই সময় কত মেয়ে যে ওর জন্য পাগল ছিল, তা যদি জানতেন!

১৩) আমার ডানদিকে সূর্যকান্ত মিশ্র। ডাক্তার মানুষ। ভদ্র, বিনয়ী। সুবক্তা। আলাপ ছিল না। আজই আলাপ হল। কিন্তু তাঁকেও চিনি অনেকদিন ধরে। এমন ভাল ডাক্তার। কত টাকা পয়সা করতে পারতেন। কিন্তু উনিও তাই। মাঠে ঘাটে সাধারণ মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

১৪) জ্যোতিবাবুর কথা বলতে গিয়ে তাঁর চেলাদের কথা এত বলছি কেন? কারণ, একটা মানুষ কেমন, সেটা তাঁর সঙ্গীসাথীদের দেখেই বোঝা যায়। এই যে এতজনের কথা বললাম, এঁদের কাউকে আপনি অসৎ বলতে পারবেন না। এঁরা কেউ কিন্তু গাড়ি, বাড়ি বা টাকার জন্য রাজনীতি করতে আসেননি। অন্য পেশায় অনেক সফল হতে পারতেন। সব হাতছানি ছেড়ে এসেছেন। জ্যোতিবাবু ছিলেন এঁদের নেতা। এঁদের দেখেই বোঝা যায়, জ্যোতিবাবু কেমন ছিলেন।

পাহাড় হাসছে, কখনও এমন ঢাক পেটাতে হয়নি

রক্তিম মিত্র

আমি তখন অনেকটাই ছোট। রাজনীতি বোঝার মতো বয়স হয়নি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম জ্যোতি বসু, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম রাজীব গান্ধী, জ্ঞান বলতে এইটুকুই। আটের দশকের মাঝামাঝি। তখন একবার দার্জিলিং গিয়েছিলাম। গরমকালেও ঠান্ডা লাগে, শোয়েটার পরতে হয়, ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছিলাম। মনে আছে ম্যালের কথা।

মনে আছে, টয় ট্রেনে চড়ে নেমে এসেছিলাম। পাহাড়ের বুক চিরে আস্তে আস্তে ছুটছে সেই ট্রেন। অনেকে ছুটতে ছুটতেই সেই ট্রেনে উঠে পড়ছে, নেমে যাচ্ছে। কিশোর মনে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। ফিরে এসে কত বন্ধুকে বলেছিলাম সেই টয় ট্রেনের কথা।

তার কয়েক মাস পরেই শুনলাম, পাহাড় নাকি উত্তপ্ত। সেখানে নাকি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন শুরু হয়েছে। আলাদা রাজ্য চাই। আমার কিশোর মন সেদিন বলে উঠেছিল, আলাদা রাজ্য হলে কি আর বেড়ানো যাবে না? যদি বেড়ানো যায়, তাহলে আলাদা রাজ্য হলেই বা ক্ষতি কী? কত রাজ্য তো আছে।

অনেকদিন ধরে এই আন্দোলন চলেছিল। কখনও গাড়ি পুড়ছে, কখনও কেউ আক্রান্ত হচ্ছে। এমন নানা খবর ভেসে আসতে লাগল। রোজই এর সঙ্গে তার মিটিং হচ্ছে। কাগজে তখন প্রায় রোজ সুবাস ঘিসিংয়ের ছবি। এই লোকটা কী চায়? যদি রাজ্যই চায়, তাহলে এত ঝামেলা করার কী দরকার? এসব কত প্রশ্ন তখন মনের মধ্যে ভিড় করত। কাগজে নানারকম বিবৃতি। কিছু বুঝতাম, অধিকাংশটাই বুঝতাম না।

অনেকদিন পর, কাগজে দেখলাম, সবাই বেশ হাসিমুখে। জ্যোতি বসু, রাজীব গান্ধী, বুটা সিং, সুবাস ঘিসিং। সবাই মিলে একটা চুক্তি করলেন। গোর্খা হিল কাউন্সিল তৈরি হল। পাহাড় শান্ত হল। নয়ের দশকেও পাহাড় গেছি। আর অশান্তির ছোঁয়া পাইনি। নতুন শতকেও গেছি। দিব্যি ঘুরে এসেছি। সমস্যা হয়নি। ২০০৫ পর্যন্ত পাহাড়ে আর আগুন জ্বলতে দেখিনি। বিমল গুরুংদের দাপট বাড়ার পর আবার অশান্ত হয়েছে।

ঘিসিংয়ের আমলে কী দুর্নীতি হয়েছে, কোথায় উন্নয়নের কাজ কেমন হয়েছে, তা জানি না। তবে এটুকু জানি, পাহাড়টা শান্ত ছিল। সেখানকার মানুষগুলো মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন। রাজ্য অকারণে নাক গলাতে যায়নি। সত্তরবার পাহাড়ে যাওয়ার ঢাক পেটাতে হয়নি।

সেই আশির দশক। দীর্ঘ আলোচনার পর শান্তির দিশা পেয়েছিল পাহাড়। ‘পাহাড় হাসছে’ জ্যোতি বসুকে কখনও এমন ঢাক পেটাতে হয়নি।

ফেসবুক ছেড়ে তিনি কিন্তু মানুষের কাছেই যেতেন

প্রতাপ ভঞ্জ

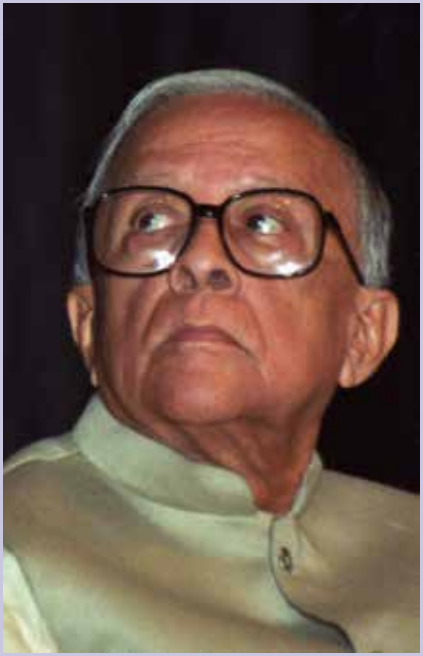

দেখতে দেখতে পনেরো বছর হয়ে গেল। ২০১০ সালের এমনই একটি সকালে বিদায় নিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। ১৭ জানুয়ারি তারিখটা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। এমনকি অন্যান্য বছর বামপন্থীদেরও মনে থাকে বলে মনে হয় না। মৃত্যুদিন তো দূরের কথা, জন্মদিনটাও বোধ হয় মনে থাকে না। ফেসবুকে দু-একজন ছবি আপলোড করেন। তা দেখে বাকিরা লাইক মেরে যান। যেন আর কিছুই করার নেই।

অথচ, অনেক কিছুই করার থাকে। তাঁর স্মরণে বিভিন্ন এলাকায় কিছু অনুষ্ঠান করা যেত। না, নেতাদের ভাষণ নয়। কোনও হলে দুর্বোধ্য কোনও সেমিনারও নয়। গঠনমূলক কোনওকিছু। ধরা যাক, রক্তদান শিবির। এটা করতে গেলে নিশ্চয় তৃণমূল হামলা করত না। ওইদিন যদি পাড়ায় পাড়ায় সাফাই অভিযান করা যেত! কোনও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো যেত! এই শীতের সময় যদি গরিব মানুষের হাতে শীতবস্ত্র বা কম্বল তুলে দেওয়া যেত!

এসব কোনও কিছুই ভাবেননি বাম নেতৃত্ব। তাঁরা মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল দিতে পারলেই খুশি। কখনও সারদা, কখনও রোজভ্যালি, কখনও শিক্ষা দুর্নীতি, কখনও রেশন দুর্নীতি— একের পর এক ইস্যুর অভাব নেই। কিন্তু শুধু অন্যকে গালমন্দ করলেই বুঝি দায় শেষ হয়ে যায়? মানুষের

আস্থা অর্জনের জন্য কী করা হচ্ছে? তৃণমূল খুব খারাপ, তাই বলে আমরা কি খুব ভাল হয়ে গেলাম। এই আত্মসমীক্ষা কি হচ্ছে ? হলেও খোলা চোখে তার প্রতিফলন তো দেখছি না।

এ বছর তবু নিউটাউনে বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে। জ্যোতিবাবুর নামে রিসার্চ সেন্টারের শিলান্যাস। খুব ঘটা করেই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। কিন্তু এতে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পড়বে বলে মনে হয় না। যাঁর সূচনা করার কথা, সেই নীতীশ কুমার নাকি আসতে পারছেন না। এমনকী একমাত্র বামশাসিত রাজ্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও শেষমুহূর্তে আসতে পারছেন না। অথচ, গত কয়েকদিন ধরে এই দুজনের নামেই সোশ্যাল মিডিয়ায়, পার্টি মুখপাত্রে লাগাতার প্রচার চলল। জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত চর্চাকেন্দ্রের গুরুত্ব কতখানি, তাঁদের হয়ত বোঝানোই যায়নি।

কবে এই ভবন তৈরি হবে, সেই ভবন সাধারণ মানুষের কী কাজে আসবে, সংশয় থেকেই যায়। তার বদলে জেলায় জেলায় (সম্ভব হলে মহকুমা স্তরে) যদি স্বল্পখরচে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়, স্বল্প খরচে ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, সেটা অনেক বেশি কার্যকরী হবে। জেলায় জেলায় শিক্ষকদের কাজে লাগিয়ে মেধাবী ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে কোচিং সেন্টার চালু করা যেত। বাম মনস্ক আইনজীবীদের নিয়ে আইনিভাবে সারাবছর পাশে থাকা যেত।

ফেসবুকে সারাক্ষণ মগ্ন থেকে, নিজেদের কর্মসূচির ছবি পোস্ট করে, পা পছন্দের পোস্টে লাইক দিয়ে একটা আত্মশ্লাঘা হতে পারে। তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। যদি সত্যিই জ্যোতিবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে মানুষের কাছে যান। কেন মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছিল, সেই কারণগুলো খুঁজে বের করুন। সম্ভব হলে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন, তখন আর তৃণমূলকে গালাগাল দেওয়ার দরকার পড়ছে না।

পানশালার সেই হারিয়ে যাওয়া সন্ধে

সুপ্রিয় চ্যাটার্জি

মধ্য কলকাতার একটি পুরনো পানশালা। ভিতরে আক্ষরিক অর্থেই তিলধারণের জায়গা নেই। কোনও মতে স্বল্প আলোতেই সন্তর্পণে পানীয়ের গ্লাস, খাবারের প্লেট টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছে দক্ষ পরিবেশনকারীরা। রঙিন পানীয়ে শূন্য গেলাস পলকেই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একধারে স্টেজ। সেখানে মাইক্রোফোন হাতে কিন্নরকণ্ঠে গাইছেন কোন সুবেশিনী যুবতী বা উচ্ছলকণ্ঠ গায়ক। যোগ্য সঙ্গতে পিছনে সারি দিয়ে বসে থাকা মিউজিশিয়ানেরা। 'তেরে বিনা জিন্দেগিসে কোই শিকওয়া', 'ইয়ে দিল তুম বিন' , 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে' থেকে 'মনে পড়ে রুবি রায়' , 'রানার' থেকে শুরু করে 'পুরানো সেই দিনের কথা' , লতা, কিশোর, রফি, আশা, মান্না, হেমন্ত, শ্যামল, আরতি সন্ধ্যা, সবার গান একের পর এক গাওয়া হয়ে চলেছে, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ইতিউতি উপস্থিতি সেখানে।

সব মিলিয়ে মিনি ফাংশন। বাড়তি পাওনা বহু পুরনো অধুনালুপ্ত গান, যা শ্রোতার অভাবে আজকাল ফাংশনে আর খাওয়া হয় না। আর সুরা কয়েক পাত্র পান করার পর সেসব গান শোনার নস্টালজিক রোমান্টিকতা আর

তো কোথাও মাথা খুঁড়লেও মিলবে না।

নৌশাদ, ও পি নায়ার, শচীন কত্তা, সবার গান শুনতে চাইলে গাইবার কুশলীর অভাব নেই। ওয়ক্ত, পাকীজা, দোস্ত, তাজমহল পুরনো বিখ্যাত সব ছবির গানের ডালি।

লাইভ ব্যান্ড। চলতি কথায় সিঙ্গিং বার। বারে সুরাপান করতে গিয়ে সাথে বাড়তি পাওনা সংগীতলহরী। সন্ধ্যা হলেই উপচে পড়া ভিড়। চাকুরী জীবী, ব্যবসায়ী, উকিলবাবু, উঠতি মস্তান, জমির দালাল, কে নেই সেই ভিড়ে। কলকাতায় নৈশ আমোদ প্রমোদের তালিকায় উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বিনোদন জায়গা করে নিয়েছে বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে।

মূলতঃ এই বারগুলি ছিল মধ্য কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডেকার্স লেনের পিঙ্করুম, মেট্রোপলিটন, চাঁদনী, ওয়াটার লু স্ট্রিটের রক্স, চেরিফিক, আর হান থাই, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মনসুখ, সি আর এভিনিউয়ে ক্যালকাটা কাফে, ডিউক, চাঁদনী চকে ম্যাজেস্টিক, নিউমার্কেট এলাকায় রক্সি, প্যারিস, প্রিন্সেস, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে গালিব, এসব জায়গায় মূলত বাংলা, হিন্দি গান হত। ইংরেজি গান হত পার্ক স্ট্রিট এলাকায়।

বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত গায়ক গায়িকা একসময় এই বার গুলোতে গান করে গিয়েছেন। উষা আয়ার (তখনও উত্থুপ হননি) পার্ক স্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁয় গেয়ে গিয়েছেন। মহম্মদ আজিজ (মুন্না) গান গাইতেন গালিব বারে।

তবে প্রদীপের নীচের অন্ধকারের কাহিনীও আছে। প্রথা অনুযায়ী, গায়িকার কণ্ঠের প্রতি অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই সুরার সাহচর্যে শ্রোতার মনকে কাঁচপোকার মতো টেনে নিয়ে গিয়েছে মোহের আবেশে, গান শুনে কিছু পারিতোষিক দেওয়ার সীমা ছাড়িয়ে বহু অর্থের অপচয়ের আঁধারে। মোহ যখন কেটেছে, আর ফেরা হয়ে ওঠেনি স্বাচ্ছল্যের দিনে। আগের সোনালী দিনগুলি হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শ্রোতার আসনে নতুন প্রজন্ম, অসামাজিক নানান চরিত্র। তাদের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে বিদায় নিয়েছে একে একে সুকণ্ঠ শিল্পীরা, তাদের জায়গায় এসেছে চটুল নৃত্যপটু কিশোরী ও যুবতীরা, মিউজিশিয়ানদের জায়গায় ল্যাপটপে ট্র্যাকে হালফিলের লাউড মিউজিক, সাইকোডেলিক আলো, অর্থের স্রোত উপচে পড়ে পানশালার মেঝেতে।

মধ্য কলকাতার এলাকা ছাড়িয়ে সিঙ্গিং বার (বর্তমানের চলতি নাম ড্যান্সবার) ছড়িয়েছে গোটা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলার শহর ও শহরতলিতে। বহু মানুষের জীবিকা যেমন চলে তেমনি প্রশাসনের স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রমোদ কাননগুলি। সংখ্যায় বেড়েছে অবশ্যই। সুখে বেড়েছে কি না জানি না। তবে মন বলে, ‘বাঁশি বুঝি সেই সুরে আর বাজবে না...’।

Sundarban Residency

এবার শীতে সুন্দরবন

2N / 3D Special Package

বিশেষ ছাড়

★ Godkhali to Godkhali

1800 103 9161

sundarbanresidency.com

স্মৃতিটুকু থাক

সেই দুপুর

বইমেলা এগিয়ে আসছে। আমার কিছু পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। স্মৃতিটুকু থাক বিভাগে তা ভাগ করে নেওয়া যাক। নয়ের দশকের গোড়ায় কলেজ জীবনে আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত। নামটা বলে তাকে আর বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না। মেয়েটির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল। মেয়েটিরও বোধহয় ছিল। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলতে পারিনি। পরীক্ষার পরই বোধ হয় তার বিয়ে হয়ে যায়। আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ বইমেলায় দেখা। সঙ্গে এক পুরুষ, সম্ভবত তার কর্তা। আমি দেখেই চিনতে পারলাম। মনে হয় সে-ও চিনতে পারল। থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তার কর্তা হনহন করে হেঁটে চলেছে। মেয়েটি কিছুটা দ্বিধায়। বরের সঙ্গে সঙ্গে যাবে, নাকি আমার সঙ্গে কথা বলবে! বরের কাছে কী বলে পরিচয় করাবে! আমি কিছুক্ষণ পিছু নিলাম। কিন্তু ডাকার সাহস পেলাম না। কী জানি, কী মনে করবে! যদি অস্বস্তিতে পড়ে যায়! মাঝে প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর পেরিয়ে গেছে। সময়ের আয়নায় ধুলো জমে গেছে। তবু পাঁচবছর আগের সেই বইমেলার দুপুরটা বড় বেশি করে মনে পড়ে।

সায়ন্তন দাস, বেলেঘাটা

ঋণী থেকে গেলাম

আমাদের সঙ্গেই কাজ করত সন্দীপন। প্রায় বছর তিনেক একই স্কুলে আমরা ছিলাম। তারপর সে কলেজে চাকরি পেয়ে গেল। চলে গেল অনেক দূরে। তখন চিঠি লেখার দিন চলে গেছে। তবু সে মাঝে মাঝেই চিঠি লিখত। আমি চিঠি লিখব লিখব ভেবেও লেখা হয়নি। মাঝে মাঝে বরং ফোন করতাম। ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল। যেতে পারিনি। এমনকি ওর মেয়ের অন্নপ্রাশনেও যেতে পারেনি। হয়ত কিছুটা ভুল বুঝেছিল। সেটাই স্বাভাবিক। যোগাযোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। এরপর আমি একটা সমস্যায় পড়লাম। আমার বাবার গুরুতর অসুখ। ভেলোরে নিয়ে গিয়ে

অপারেশন করাতে হবে। লোন নিয়ে বাড়ি করেছিলাম। কিছু দেনাও ছিল। তাই আমার তখন হাতখালি। যাদের কাছে চাইছি, অনেকেই এড়িয়ে যাচ্ছে। তখন মনে পড়ল সন্দীপনের কথা। তার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আর উপায় কী? খুব সঙ্কোচ নিয়েই চাইলাম। সে পরের দিনই আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ফেলে দিল। যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশিই দিল। বাবা অপারেশনের পর এখন সুস্থ। বাড়িতে আসার পর সন্দীপন একবার দেখতেও এসেছিল। বলে গেল, কোনও তাড়া নেই, যখন পারবে, তখন দিও। ওর টাকা নিশ্চয় একদিন শোধ করব। কিন্তু ওর কাছে চিরঋণী হয়ে থেকে গেলাম।

প্রলয় বসাক, বাগনান

****

ক্ষমা চাইছি

সত্যি কথা বলতে পারিনি

বছর দশেক আগের কথা। সেবার আমার এক কাকু বইমেলায় কয়েকটা বই কিনতে দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, তুমি বই পাঠিয়ে দিও। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আমি দুদিন বইমেলা গেলাম। কিন্তু বই কিনলাম না। দুটো কারণ, সেই দুদিন আমার কাছে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। তাছাড়া, ভেবেছিলাম এখনও তো চার–পাঁচদিন বইমেলা চলবে। পরে কোনও একদিন এসে কিনে নেব। কিন্তু তার পর থেকে অফিসের নানা ঝামেলায় আটকে গেলাম। আর বই-মেলায় যাওয়াই হল না। ফলে সেই কাকুর বইগুলোও কেন হল না। বাড়ি গেলাম। সেই কাকুকে দেখে কেমন একটা লজ্জা পেলাম। কী করব বুঝতে না পেরে এড়িয়ে গেলাম। কাকুকে আসতে দেখে, ব্যস্ততার ভান করে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে চলে গেলাম। কাকু হয়ত বুঝতে পারলেন। অথচ, সত্যি কথাটা বলতে পারলে আর অস্বস্তি থাকত না। এখনও যখন মনে পড়ে, তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। এই লেখার মাধ্যমে সেই কাকুর কাছে ক্ষমা চাইছি।

রাজকুমার মুখার্জি, নাকতলা

স্মৃতিটুকু থাক

সেই মাধবকাকুরা হারিয়ে যাচ্ছে

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক মফস্সলে। আমাদের এলাকায় একজন পিওন এসেছিলেন। আমরা তাঁকে মাধবকাকু বলতাম। মাত্র কয়েক-দিনেই সবাইকে দিব্যি চিনে নিয়েছিলেন। কার কাছে কী ধরনের চিঠি আসে, কোন চিঠি কাকে দিতে হয়, ঠিক জানতেন।

একবার আমাকে খুব বড় একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এক বিয়ে-বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু সে যে এভাবে চিঠি লিখে ফেলবে, কে জানত! প্রেম নিবেদন করে মস্ত এক চিঠি পাঠিয়েছিল। ওই চিঠি যদি বাবার হাতে যেত, নির্ঘাত বকুনি জুটত।

মাধবকাকু সেই চিঠি বাবার হাতে দেননি। আমাকে দেখতে পেয়ে একদিন ডাকলেন। বললেন, 'তিন দিন ধরে তোমাকে খুঁজছি। ইচ্ছে করেই বাড়িতে দিইনি। কোনও ভয় নেই। তোমার চিঠি আমি তোমাকেই দেব।'

এখন লোকে চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে। মাধবকাকুদের মতো চরিত্ররাও বোধহয় হারিয়ে গেছে।

পিয়ালি সেনগুপ্ত, ভদ্রেশ্বর

(এই বিভাগ কিন্তু একান্তই পাঠকদের জন্য। আপনারাও লিখে পাঠান আপনাদের অনুভূতি। বিশেষ কারও কথা মনে পড়ছে? অতীতের কোনও কাজের জন্য ভুলস্বীকার করতে ইচ্ছে করছে? বলে ফেলুন। দেখুন, অনেক হালকা লাগবে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: bengaltimes.in@gmail.com)

লাইফস্টাইল

সকালে না উঠলে অর্ধেক কাজ মিস করে গেলেন

শ্রীপর্ণা গাঙ্গুলি

সাতসকালে ঘুম থেকে ওঠা সত্যিই বেশ কষ্টের। শীতকাল হলে তো আরও কঠিন। লেপের আশ্রয় ছেড়ে কার আর উঠতে ইচ্ছে করে? কিন্তু ভোরে উঠতে শুরু করলে তখন দেখবেন ভোরটা সত্যিই সুন্দর। সবাইকে উঠতেই হবে, এমন নয়। কিন্তু যাঁরা উঠতে চান, অথচ উঠতে পারেন না, তাঁদের জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

❑ ভোরে উঠতে হবে বলে বেশি চাপ নেবেন না। রাতে যদি বারবার এটাই ভাবতে থাকেন, তাহলে ঠিকঠাক ঘুম হবে না। বরং ভাবুন, না উঠলেও মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না। নিজেকে হালকা রাখুন।

❑ ভোরে উঠতে গেলে রাতে ঠিকঠাক

ঘুমোনোটা খুবই জরুরি। চেষ্টা করুন রোজ একই সময়ে ঘুমোতে যাওয়ার।

❑ ঘুমোনোর জন্য পরিশ্রম জরুরি। সারাদিন যদি কাজের মধ্যে থাকেন, দেখবেন সহজেই ঘুম এসে যাবে।

❑ রাতে সোশাল সাইট একেবারেই নয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ বা ইউটিউবকে গুডবাই বলতে শিখুন।

❑ সম্ভব বলে রাতে বই নিয়ে শুতে যান। পড়তে পড়তে ভাল ঘুম হয়। তবে খুব বেশি বইয়ে ডুবে যাবেন না।

❑ ফ্রি কলের দৌলতে অনেকে হয়ত ফোন করবে। রাতের দিকে সেগুলো না ধরাই ভাল। অন্যের ফোন ফ্রি বলে আপনি ঘুম নষ্ট করবেন কেন? পারলে ফোনটা বন্ধই রাখুন। মিসড কল অ্যালার্ট থাকলে কারা ফোন করেছিল, পরে ঠিক জানতে পারবেন।

❑ সকালে একটা লক্ষ্য থাকলে ওঠাটা সহজ হয়। লক্ষ্য না থাকলে শিথিলতা এসে যায়। তাই নিজেই কোনও একটা লক্ষ্য ঠিক করে নিন।

❑ অনেকেই অ্যালার্ম দিয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অ্যালার্ম বাজার পর তা বন্ধ করে দেন। তাই ফোনে বা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিলে তা দূরে রাখুন।

❑ অনেকেই রাতে বারবার প্রস্রাবে ওঠেন। সারাদিন পর্যাপ্ত জল খান। তবে সন্ধ্যের পর জল কম খাওয়াই ভাল। এতে ঘুমের বিঘ্ন ঘটবে না। পারলে সকালে উঠে স্নান করে নিন। দেখবেন, অনেক ঝরঝরে লাগছে।

❑ হাঁটার লক্ষ্য রাখুন। পারলে ভাল সঙ্গী জুটিয়ে নিন। দেখবেন সেই সঙ্গীর হাতছানিতে আপনি ঠিক উঠে পড়েছেন।

আপনার বেড়ানোর গল্প

শীত বা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্ত, প্রায় সব ঋতুতেই বাঙালির মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল— সে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়েও। সবার ঝুলিতেই বেড়ানোর অনেক গল্প জমে থাকে। ভাল লাগা, মন্দ লাগা— নানা অনুভূতি সে ভাগ করে নিতে চায়। কেউ ম্যাগাজিনে লেখে, কেউ ফেসবুকে লিখেই তৃপ্ত হয়। কেউ অনেককিছু লিখব ভাবে, কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠে না।

আপনার বেড়ানোর সেই ডায়েরি যদি বেঙ্গল টাইমসে উঠে আসে, কেমন হয়! লিখে ফেলুন আপনার অভিজ্ঞতার কথা। ‘কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা’ টিপিক্যাল ছকে বাঁধা ভ্রমণ কাহিনী নয়। আপনি লিখুন আপনার মতো করেই। কোনও ফর্মুলা মেনে নয়, যা লিখতে ইচ্ছে করছে, আপনি সেটাই লিখবেন। বেড়ানো মানে পুরো সফরের বর্ণনা নয়। টুকরো টুকরো কত মুহূর্ত, কত মানুষ, যা খুশি লিখতে পারেন। নমুনা দেখতে হলে একবার বেঙ্গল টাইমসের ভ্রমণ বিভাগে উকি মারতে পারেন। এমন নানা লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অনেকেই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাই অনেকের মধ্যেই লেখার আগে একটা হীনমন্যতা এসে যায়। সেই হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলুন। আপনি শুধু আপনার অনুভূতির কথা লিখুন। খারাপ হল না ভাল হল, সেই ভাবনা শিকেয় তুলে রাখুন। কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকলে সম্পাদনার পর তা দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আপনার লেখা সাজিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

সাহস করে লিখুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়। আর হ্যাঁ, সঙ্গে ছবি থাকলে, তাও পাঠিয়ে দিন। যদি ছবি না থাকে! চিন্তার কিছু নেই। সবজান্তা গুগল তো আছেই।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
bengaltimes.in@gmail.com

পড়শি রাজ্যে সাতটা দিন

রাজর্ষি সরকার

এ বাবা ঝাড়খণ্ড যাচ্ছিস? ওখানে আবার কী দেখার আছে? এ বাবা, রাঁচি যাবি ওই পাগলা গারদ দেখতে? এরকম আরও অনেক কথা অনেক মানুষের কাছ থেকে শুনতে হয়েছিল যখন এই বছর ঠিক করেছিলাম দুজন বন্ধু মিলে নিজেদের গাড়ি করে ঝাড়খণ্ড যাব। তবে ঘুরে এসে ছবি দেওয়ার পর সেইসব মানুষরাই বলতে শুরু করেছে, এই জায়গাটা দারুন, এটা কোথায়? আমার উত্তর তখন ছিল এটা ওই পাগলা গারদের ভিতরটা। এতটাই সুন্দর। কারণ আমার মতো প্রকৃতি পাগলদের জন্য প্রকৃতির এই দৃশ্যপট তো পাগলা গারদের মতোই।

প্রতিবারের মতো এবারও পুজোয় কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছিল। কারণ বেশ অনেকদিনই কোথাও বেরোনো হয়নি। হাতে মাত্র সময় ছিল একমাস। নিজেদের গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম ঝাড়খণ্ড যাব। রাঁচি, বেতলা, নেতারহাট এবং সেটা দেখতে দেখতে আরও এক দারুন জায়গার খোঁজ পেলাম। যেটা দেখার পর থেকে সেখানে না যাওয়ার কোনও কারণই পাচ্ছিলাম না। এক প্রকার দেখে পাগল হয়েগেছিলাম। সেটা হল

মারোমার্ ফরেস্ট রেস্ট হাউস। সেটা বুকিংয়ের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল যদিও, কিন্তু পেয়েছিলাম। আর সেই কষ্ট বিফলে যায়নি।

যাই হোক, সেই কথায় পরে আসছি। যথারীতি পুরো প্রোগ্রাম সাজিয়ে ফেললাম এবং মাত্র দুজন বন্ধু মিলে গাড়িতে করে যাওয়া ঠিক করে ফেললাম। ২ তারিখ সকালে রওনা এবং ৯ তারিখ ফেরা। রাঁচি, পত্রাতু, মারোমার্, বেতলা, নেতারহাট এই ছিল আমাদের ট্যুর প্ল্যান। বেশ অনেকটাই জার্নি এবং বড়ো প্ল্যান। ইচ্ছা আর মনের জোরটাই আসল। এটা মাথায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

যাত্রা শুরু ভোর সাড়ে পাঁচটায়। মোট রাস্তা ৪১০ কিমি। রুট ছিল কলকাতা, কোলাঘাট, খড়্গপুর, জামশেদপুর, রাঁচি। প্রথম দাঁড়ালাম কোলাঘাটের একটু পর ব্রেকফাস্ট সারার জন্য। তারপর আবার যাত্রা শুরু। রাস্তার বর্ণনা আর না করাই ভাল। অপূর্ব রাস্তা। আর জামশেদপুরের আগে থেকেই দু'পাশের দৃশ্য পাল্টাতে থাকে। ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। পাহাড় বলা হয়তো ভুল হবে। তাও বললাম। রাস্তার দৃশ্য অপূর্ব চারিদিকে। রাঁচি ঢোকার আগে দশম ফলস এবং চান্ডিল ড্যাম দেখে নিলাম। কারণ, ওই দুটো জায়গা রাঁচি ঢোকার আগে পড়ে। দুটো জায়গাই অপূর্ব। সব দেখে আমরা সেদিন রাঁচি ঢুকলাম বিকেল সাড়ে চারটেয়। মোট সময় লাগল ১১ ঘন্টা। দু'বার খেতে দাঁড়ানো, দু'বার দৃশ্য দেখতে দাঁড়ানো, দশম ফলস, চান্ডিল ড্যাম সব মিলিয়ে। টোল ট্যাক্স দিতে হয়েছে মোট ৫০৫ টাকার।

পরের দিনের প্ল্যান ছিল জোনহা ফলস, সীতা ফলস, হুণ্ডু ফলস, গেতালসূদ ড্যাম। রাঁচি শহরের ভিতরের রাস্তাও বেশ ভাল। কোথাও পৌঁছাতে কোনও অসুবিধা হয়নি গুগল ম্যাপকে ভরসা করে। জোনহা ফলসে প্রায় ৪০০ সিঁড়ি, সীতাতে ৩৫০ সিঁড়ি এবং হুণ্ডু ফলসে ৭৫০ সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বসার জায়গা অনেক আছে। ভেঙে ভেঙে উঠতে চাইলেও কোনও সমস্যা হবে না। আমার ব্যক্তিগতভাবে সীতা ফলসটা খুব সুন্দর লেগেছে। চারপাশের পরিবেশটা বেশ সুন্দর জঙ্গলে ঘেরা। বাকি গুলোও দারুন। সকাল ৯ টায় আমরা বেরিয়েছিলাম। সেদিন সব দেখে হোটেলে ফিরলাম সন্ধে ৬ টা নাগাদ। সন্ধেবেলা বেরিয়ে হোটেলের চারপাশটা, মানে রাঁচির রাস্তায় একটু ঘুরছিলাম। আপনার হঠাৎ মনে হতেই পারে আপনি কোনও শপিং মলের

ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশাল বড় প্রতিটা ব্র্যান্ডের আলাদা আলাদা ঝাঁ চকচকে দোকান। সে এক জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাপার। বেশ ভালই লাগল।

পরদিন বেরিয়ে পড়লাম সকাল ৯ টায়। গন্তব্য পত্রাতু ভ্যালি, পত্রাতু লেক, কানকে ড্যাম, টেগোর হিল। রাস্তা সেই আগের মতোই অপূর্ব। পত্রাতু ভ্যালিতে গাড়ি করে ওঠার মজা কোনও পাহাড়ে ওঠার চেয়ে কম না। ঘোরানো পেঁচানো অপূর্ব রাস্তা। পৌঁছানোর পরে ভ্যালির দৃশ্য দেখে চোখ মন সব ভরে গেল। অসাধারণ একটি জায়গা। ভ্যালি থেকেই লেকটা দেখা যায়। যেতে ইচ্ছা করছিল না ভ্যালি থেকে।

যাই হোক, কষ্ট করে বেরিয়ে গেলাম চলে গেলাম লেকে। সেটাও দারুন। দৃশ্য ভাল হলেও মোটামুটি লেকের চারপাশে মেলা বসেছে। প্রচুর মানুষ, প্রচুর দোকান, মাইকে গান হচ্ছে, বোটে ওঠার জন্য ডাকাডাকি হচ্ছে, সে এক ব্যাপার বটে। আমরাও স্পিড বোট সফর করলাম। বেশ মজাদার ব্যাপার। লেকটায় ঘোরাবে মিনিট ২০-২৫। বেশ সুন্দর অভিজ্ঞতা। সব সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে কানকে ড্যাম আর টেগোর হিল দেখে ফেললাম। টেগোর হিলের একদম ওপর থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়। খুব সুন্দর একটি ভিউ। সব দেখে সেদিন হোটেল ফিরলাম ৫ টা। পরেরদিন এর জন্য উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল, কারণ পরেরদিন মারোমার্ এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা।

চতুর্থ দিন। সকাল সকাল উঠে বেরিয়ে পড়লাম মারোমারের উদ্দেশ্যে। বেশ অনেকখানি রাস্তা। রাঁচি থেকে প্রায় ১৭০ কিমি। ৪ ঘন্টা লেগে যাবে। অসাধারণ রাস্তা এবং অসাধারণ রাস্তার চারপাশের দৃশ্য। বর্ণনা করা সত্যি কঠিন।

তার থেকে বরং মুগ্ধ হওয়াই বেশি সহজ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে যেতে হবে। অনেকবারই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য। মারোমার্ আসার পথে বেশ কিছু ছোটোখাটো বাজার পড়ে। কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার থাকলে এখান থেকে কিনে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের লাগলো প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা। কারণ রাস্তায় অনেকবার দাঁড়িয়েছি। দুপুর ২ টো নাগাদ পৌঁছালাম মারোমার্ ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। আমাদের ট্রি হাউস বুক করা ছিল। সেখানকার দৃশ্য এবং চারপাশ চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতোই। দুপুরে দেশি মুরগি দিয়ে ভাত খাবার অভিজ্ঞতাও দারুন। সেদিনটা শুধুমাত্র রুমের বারান্দায় বসে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতেই করতেই কখন সময় কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। দিনের এক রূপ, রাতের রূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। জঙ্গলের ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ, চারিদিক অন্ধকার (কারণ, মারোমার এ সন্ধের পরে লাইট থাকে না)। আকাশে মেঘের খেলা, চাঁদের উঁকি মারা, পাস্ দিয়ে বয়ে চলা ঝর্নার শব্দ, সাঙ্ঘাতিক নিস্তব্ধতা। আরও কত কী, বোঝানো কঠিন। না গেলে এ জিনিস উপভোগ করা যাবে না।

অসাধারণ একটা রাত কাটানোর পরে পঞ্চম দিনের গন্তব্য ছিল বেতলা ফরেস্ট, কেচকি সঙ্গম এবং পালামৌ ফোর্ট। যেতে একটু বেলা হয়ে যাওয়ায় বেতলা সাফারিতে সেরকম কিছু দেখতে পাইনি। কিছু হরিণের পাল, বাঁদর এবং হনুমান ছাড়া। তবে জঙ্গলের নিজস্ব একটা সৌন্দর্য থাকে। তার নিজস্ব একটা আমেজ থাকে। সেটাই বা কম কী? বেতলা দেখে চলে গেলাম কেচকি সঙ্গম দেখতে। ফেরার পথে পালামৌ ফোর্ট। ফিরে এলাম দুপুরের মধ্যে। খাওয়াদাওয়া সেরে আবার সেই অসামান্য দৃশ্য আর পরিবেশ উপভোগ করা।

রাতেরবেলা উপরি পাওনা হিসেবে শুনেছিলাম হাতির ডাক, একবারই। তবে সেটাই পিলে চমকানোর জন্য যথেষ্ট। টর্চ জ্বালিয়ে একটু খুজেঁওছিলাম চারিদিকে, যদি দেখা যায়। কিন্তু দেখতে পাইনি।

ছ'নম্বর দিনের অভিজ্ঞতা পুরো অন্যরকম। আমাদের এই দিনের প্ল্যান ছিল মারোমার্ থেকে বেরিয়ে সামনেই একটা মিরছাইয়া ফলস আছে। সেটা দেখে তারপর সুগ্গা বাঁধ এবং লোধ ফলস দেখে নেতারহাট পৌঁছানো। তবে বাধ সাধল আমাদের গাড়ি। গাড়িতে কিছু সমস্যা হওয়ার কারণে আমরা সেদিন কোথাও যেতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল গাড়ি সারিয়ে নেতারহাটে চলে যাওয়ার। কিন্তু গাড়ি সারাতে সারাতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি পুরো ঠিক না হওয়ায় পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার রিস্ক নিতে চাইনি। ঠিক করলাম, কোনওমতে এখানে রাত কাটিয়ে সকালে রাঁচি পৌঁছে গাড়িটা পুরো ঠিক করে নেওয়া হবে। সেদিন মারোমার্ কিছুটা আগে গারু বাজারের কাছে গাড়ি সারাতে সন্ধে ৭ টা বেজে গিয়েছিল। তবে সন্ধে ৭ টা বাজার পরে আমাদের আর কোথাও যাওয়ার উপায়

ছিল না। কারণ, ওখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র মারোমার্ ট্রি হাউস ছাড়া। সেটিও পুরো বুক ছিল সেদিন। ভেবেছিলাম জঙ্গলের মধ্যে গাড়িতে বসে রাত কাটাতে হবে। যাক, সেটা করতে হয়নি। ডালটনগঞ্জ অফিসে ফোন করে ঘটনাটা জানানো হল। বলা হল, দেখছি, কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঠিক ১৫ মিনিট পরেই আমার ফোনে একটা ফোন এল। রিসিভ করে আনন্দ এবং উত্তেজনা দুটোই এক-সঙ্গে হল। ওখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার স্যার নিজে ফোন করেছিলেন। বললেন, কোনও চিন্তা নেই। সামনেই আমার বাংলো। আপনারা ওখানে চলে আসুন। রাতে থেকে যাবেন। যথারীতি সেখানে গেলাম এবং রেঞ্জার স্যার নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করে রুম দেখিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর চলে গেলেন। খুবই ভাল লাগল মানু-ষটিকে। সেই বাংলো এবং আন্তরিক ব্যবহার দুটোই মনে থেকে যাবে।

সপ্তম দিন। প্ল্যান মতো এই দিনের কাজ ছিল কোনওভাবে রাঁচি পৌঁছে গাড়ি ঠিক করে নেওয়া। সকাল সকাল রেঞ্জার স্যারের সঙ্গে একবার দেখা করে বেরিয়ে পড়লাম রাঁচির উদ্দেশ্যে। ঠিক করেছিলাম রাস্তায় গাড়ি সমস্যা করলে লাতেহার বাজারে গাড়ি সারাবো। কিন্তু গাড়ি কোনও সমস্যা করেনি। একেবারে রাঁচি পৌঁছে গেছি। তারপর সেখানে গাড়ি ঠিক করিয়েছি। গাড়ি ঠিক করে নিয়ে আরও একবার পত্রাতু ভ্যালি থেকে ঘুরে এসেছি, যেহেতু কিছু করার ছিল না।

এবার চলো মন নিজ নিকেতনে। কলকাতা ফেরার দিন। ফেরার পথে জামশেদপুরের কাছে ডিমনা লেক ঘুরে নিয়েছিলাম। বেশ সুন্দর জায়গা। ফেরার দিন আমরা সকালে বেরিয়েছিলম ৬ টায়। কলকাতা পৌঁছোলম দুপুর দুটো নাগাদ।

ভ্রমণ

সঙ্গে যেত ধোপা, নাপিত

বেড়াতে গিয়েই হয়েছে প্রেম, বিয়েও। কত অজানা কাহিনী এই কুণ্ডু স্পেশালকে ঘিরে। সেই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার সৌমিত্র কুণ্ডুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার। তাঁর মুখোমুখি বেঙ্গল টাইমসের প্রতিনিধি অয়ন দাস।।

শুধুমাত্র নিখাদ ভ্রমণপিপাসু মনোভাবে ১৮৩৩ তে দিনের আলো দেখা এক ভ্রমণ প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ ৮৯ বছর অতিক্রম করে মহীরূহ বৃক্ষে পরিণত আজ। তা সে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেনের কলমে হোক বা ফেলুদার মগজাস্ত্র 'কৈলাসে' যাবার হোক না কেন, বাঙালির মননে 'কুণ্ডু স্পেশ্যাল' মানেই বাঙালিয়ানাকে চেটেপুটে উপভোগ করা। আস্ত একটা ট্রেনের কামরা বুক করে বেড়াতে যাওয়া। সঙ্গে ধাঁধুনি তো আছেই, সেইসঙ্গে লম্বা সফরে ধোপা–নাপিতও যাচ্ছেন আপনার সঙ্গে।

কুণ্ডুরা কেন 'স্পেশ্যাল

সৌমিত্র: কুণ্ডু স্পেশ্যাল আমাদের কাছে নিছক ব্যবসা নয়, আমাদের কাছে সততা, সেবা, আথিয়েতার প্রতিষ্ঠান। প্রথম থেকেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল কম খরচে মানুষকে ভাল জায়গায় রাখা, ভাল গাড়িতে নিয়ে যাওয়া, ভাল পরিষেবা দেওয়া। তাই আমরা মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, তাঁরা আমাদের সঙ্গে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

কুণ্ডু 'ভোজ' স্পেশ্যাল

সৌমিত্র: আগে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল- 'আর কী চাই দাদা, সকালে লুচি, রাতে লুচি, এতো বাড়িতেও হয় না।' আগে প্রতিদিন সকালে এমনকি চলন্ত ট্রেনেও গাওয়া ঘি-এর লুচি ভাজা হত। কিন্তু এখন রেলের নিয়মের কারণে কেবল হোটেলেই লুচি হয়। তবে মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য-সচেতন, আর এখন অনেক নতুন নতুন মেনু থাকায় বিভিন্ন খাবার খেতে চান। আমাদের নিজস্ব রাঁধুনিরা থাকেন ট্যুরে, তাঁরাই যে যেমন খাবার পছন্দ করেন, তাই রান্না করেন। লুচি, বিরিয়ানি থেকে শুরু করে পোলাও,

চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল যে ধরণের খাবারই মানুষ খেতে ভালোবাসেন তা তাঁরা কব্জি ডুবিয়ে খেতে পারেন। এমনকি যাঁদের সুগার আছে তাঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে আমাদের 'খাবার'-এর ঐতিহ্যের স্বাদ চেটেপুটে নেবার জন্য কোনওরকম বাঁধন রাখেন না ওই কদিনের জন্য। এমনকি অনেক অ-বাঙালিও আমাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের সেই 'ঐতিহ্যমণ্ডিত'ই খাবার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন।

স্মৃতিমেদুর 'ডানলপ পিলো'

আগে ট্রেনে শক্ত কাঠের গদিতে শোবার অসুবিধা যাতে না হয় তাই 'ডানলপ পিলো' দেওয়া হত, কিন্তু এখন ট্রেনে শোবার ভাল বন্দোবস্ত থাকায় তা আর দেওয়া হয় না। তাছাড়া এখন সবাইকে হোটেলে রাখা হয়, আর মানুষও এখন 'প্রাইভে-সি' পছন্দ করেন।

আমন্ত্রণ রইল.....

বুদ্ধদেব গুহ তাঁর লেখায় একবার বলেছিলেন "মা আমার জন্য পাত্রী পাচ্ছিলেন না, তারপর কুণ্ডু স্পেশ্যালে বেড়াতে গেলেন, আর আমার বিয়ে হয়ে গেল।"

এরকম অনেকবারই হয়েছে কোনও ট্যুরে গিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, আবার অনেকের প্রেম হয়ে বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। বিয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসে যখন বলেন আপনাদের সঙ্গে গিয়ে পরিচয়, তখন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের সাফল্য নিয়ে গর্ব হয়। আমাদের বেশিরভাগ মানুষ বাঙালি হওয়ায় তাঁদের মধ্যে এই বাঙালি নস্টালজিয়াকে ঘিরে আত্মিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

পর্যটক থেমে থাকে না, এগিয়ে যায়...

আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের মানুষ যান, বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাঁরা অনেক সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে দেখানো হয়, প্রয়োজনে হাসপাতালেও ভর্তি

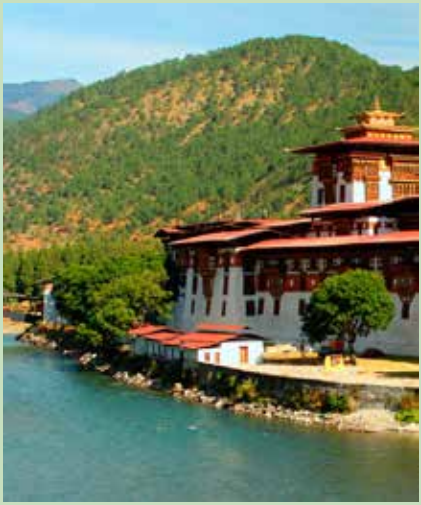

করানো হয়। আমাদের দুজন ম্যানেজার অসুস্থ ব্যক্তির কাছে থাকা থেকে শুরু করে তাঁর পরিবারকে জানানো ও সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করেন। আমরা অসুস্থতার জন্য কোনও অর্থ চাই না পরিজনদের থেকে। অপর ম্যানেজার অন্যান্য পর্যটকদের নিয়ে বাকি ট্যুর করেন। তবে অনেক সময়েই পর্যটকদের সেই স্বল্প আলাপেই এতটাই হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তাঁরাও থেকে যান।

আমরা আছি

আমাদের পর্যটকদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দেখভাল করি আমরা। প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময়ে হেলিকপ্টারে হোক বা সে পুলিশি এসকর্ট করেই হোক পর্যটকদের পুরো নিরাপত্তা–সহ ফিরিয়ে আনা হয়। সেই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আমরাই সব খরচ বহন করি।

হোর্ডিংয়ে ঢাকে না মুখ

বছর কয়েক আগে এক বৃদ্ধা দম্পতি ট্যুরের শেষে বলেছিলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরাও যত না করেছে, তার থেকে বেশি তোমরা করেছ।" –এটাই তো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। আমরা বছরের পর বছর ধরে ভাল পরিষেবা প্রদান করেছি। এখন তো ট্রেন প্রায় লেট হয়, রেল থেকে খাবার দেয় না, আমাদের ম্যানেজাররা চলন্ত ট্রেনেই যথাসম্ভব খাবার জোগাড় করে মানুষকে দেন। এই বিশ্বাস, নিরাপত্তাই তো আমাদের বিজ্ঞাপন। কুণ্ডু স্পেশ্যালে একবার গিয়ে কেউ থেমে যান না, এমনকি সব ট্যুর হয়ে গেলেও তাঁরা ট্যুর 'রিপিট' করেন আমাদের পরিষেবা, ঐতিহ্যকে উপভোগ করার জন্য।

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে...

শ্যামল মুখার্জি

পাহাড় বলবেন নাকি ছোট ছোট টিলা! দলমা রেঞ্জের দিকে গেলে এমন কত অসংখ্য টিলা দেখা যায়। কোনওটা রুক্ষ, কোনওটা আগাছায় ঢাকা। ট্রেনে যেতে যেতে বা বাসে যেতে যেতে দূর থেকেই সেইসব টিলা দেখেছি। কাছে যাওয়া হয়নি। কী জানি, যদি সাপখোপ থাকে! যদি বন্য জন্তু থাকে। তাছাড়া, ওই টিলায় কোন বাস দাঁড়াতে যাবে! কেনই বা দাঁড়াতে যাবে!

এই টিলা একেবারেই অন্যরকম। পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান নতুন কিছু নয়। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে এমন কত বাগান উঁকি দেবে। কিন্তু এই গোলপাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যরকম। একের পর এক ছোট্ট গোল গোল পাহাড়। সবগুলিই প্রায় একই উচ্চতার। সব ছোট পাহাড়গুলোই চা-গাছে ঘেরা। ধূসর বা রুক্ষ বাগান নয়, চরাচরজুড়ে সবুজের অভিযান। দু'পাশে দুটো গোল পাহাড়, মাঝের রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা ভাবলেই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ এসে যায়।

এই পথে বেশ কয়েকবার পেরিয়ে গেছি।

মিরিক থেকে দার্জিলিং ওঠার রুট। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা উঠে গেছে কার্শিয়াং হয়ে। অঞ্জন দত্তর গানের ভাষায়, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে। সবাই এই রাস্তা দিয়েই ওঠেন। কারণ, সময় কিছুটা কম লাগে। কিন্তু হাতে যদি একটু বাড়তি সময় থাকে, তাহলে একবার মিরিক হয়ে উঠতে পারেন। যাওয়ার পথেই নেপাল সীমান্ত, টুক করে একবার ঝটিকা সফরে বিদেশ ভ্রমণ করে নিতে পারেন। নিদেন পক্ষে ওপারে গিয়ে এক কাপ চাও খেয়ে আসতে পারেন। আবার ভারতের ভূখণ্ডে ফিরে এসে সুখিয়া পোখরি, লেপচা জগৎ, ঘুম হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যেতে পারেন।

দূরত্ব একটু বেশি ঠিকই, তবে চা-বাগান আর পাইন বনে ঘেরা রাস্তা একটা বাড়তি রোমাঞ্চ এনে দেবে। আমাদের এই গোলপাহাড় অবশ্য এতটা দূরে নয়। তার অনেক আগেই। ধরে নিন মিরিক থেকে আরও আধ ঘণ্টার মতো। এখানে

পাহাড়টা একেবারেই অন্য রকম। ছোট ছোট টিলা। সাহেবরা চা-বাগান বানাতে গিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, আর কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না।

এর সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। তাঁর হোম স্টেতেই ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোথায়? সেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, নেপাল সীমান্তের কাছে একটা গ্রাম আছে, একেবারে চা-বাগানের মাঝেই। দেখুন, আপনাদের ভাল লাগবে। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন মঞ্জোশীলা হোম স্টের। আসলে, তাবাকোশি এতটাই ভাল লেগেছিল যে সংশয় হচ্ছিল, পরের জায়গাটা যদি ভাল না হয়। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, মুগ্ধতা যেন তত বাড়ছে। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে মেঘ ভেসে আসছে। সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তো আছেই। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই ভিউ পয়েন্ট।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম মঞ্জোশীলায়। একমুখ হাঁসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। ভারী চমৎকার মানুষ। এমন সরল, আন্তরিক ও অতিথি পরায়ণ মানুষ চাইলেও ভুলতে পারবেন না। পুরো বাড়িটাই পাইন কাঠে মোড়া। সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন। সেখানে

বসলেই হাতের সামনে ধরা দেবে সেই গোলপাহাড়। ঘরের বিছানায় বসে মনে হবে, জানালার ওপারেই যেন চা বাগান। এত কাছ থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। মনের মধ্যে জমে থাকা নাগরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি একলহমায় যেন হারিয়ে যায়। মনে হবে, চুলোয় যাক কাজবাজ, চুলোয় যাক ব্যস্ততা। সব ছেড়ে এখানেই থেকে যাই। সঙ্গে যদি এমন আতি-থেয়তা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একটা ছোট্ট সতর্কীকরণ: দিনের বেলা বেশ রোমাঞ্চকর। তবে সূর্য ডুবলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই পর্যাপ্ত শীতপোশাক নিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলাদা করে কোনও গাড়ি নেওয়ার দরকার নেই। আলতো পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যান গোলপাহাড় ভিউ পয়েন্টের দিকে। হাঁটা পথে মিনিট দশ। দু-পাশে খাড়া চা-বাগান। আপনি আপন মনে হেঁটে যান। যতদূর মন চায়। কখনও ইচ্ছে হলে কোনও এক টিলায় উঠে পড়ুন। ছবি তোলার শখ থাকলে এটুকু হলফ করে বলা যায়, আপনার সেরা মুহূর্তগুলো হয়ত এই গোলপাহাড়ের জন্যই তোলা আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ঘটা করে টাইগার হিল যেতে হবে না। হোম স্টের সামনের ওই ছোট্ট পাহাড়ে উঠে পড়ুন। পাহাড় শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উঠতে লাগবে বড়জোর মিনিট দশেক। বয়স্করাও অনায়াসে উঠে পড়তে পারেন। একটু শুধু সাত সকালে উঠে পড়ুন। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি কীভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ঠিকরে পড়ছে, কীভাবে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ছন্দে ছন্দে রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে থাকুন। কখনও হয়ে উঠছে বাদামি, কখনও সোনালি, আবার কখনও ঝকঝকে সাদা।

ছবি কত কথা বলে যায়! গুগলবাবু তো আছে। একবার গোলপাহাড় লিখে দেখুন। তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাইলে ইউটিউবের শরণ নিতেই পারেন। একবার শুধু একঝলক দেখে নিন। যেমন দেখছেন, তার থেকে ঢের ভাল। তথাকথিত দার্জিলিং, গ্যাংটক তো অনেক দেখেছেন। এবারের ঠিকানা হোক একটু নিরিবিলিতে। ওই গোলপাহাড়ে অলসভাবে দুটো দিন কাটিয়ে আসুন।

বেঙ্গল টাইমস

১৭ জানুয়ারি সংখ্যা

আলোর পথযাত্রী

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।
ফোন ৯৮৩১২২৭২০১। ইমেল: bengaltimes.in@gmail.com

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

ISSN 2445 5657 bengaltimes.in